দৈনিক ইনকিলাব

দেশের ১৬ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারী অনুদান বঞ্চিত : শিক্ষকদের দুর্বিষহ জীবন যাপন

।। মোঃ আজিজুল হক বাবুল ।।

বাংলাদেশ সরকারের দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' স্কীমের আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ ব্যাপকভাবে চলছে। এর সফলতার জন্য অনেকগুলো সমস্যা ও প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা, আর্থিক সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা রয়েছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৪ সাল থেকে এ পর্যায় মঞ্জুরীপ্রাপ্ত প্রায় ১৬ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। সে সব মাদ্রাসায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের বাংলা, অংক, ইংরেজী বিষয়সহ আরবী ও ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াদী পড়ানো হয়। যা সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পূরক আর সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার একান্ত সহায়ক। এবতেদায়ী মাদ্রাসার ব্যাপারটি একটু ভাল করে বলার দরকার এখানে। এ মাদ্রাসাগুলো মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক অর্ডিন্যান্স বলে চালু করেন। মঞ্জুরী দেয়ার জন্য মাদ্রাসা বোর্ডকে ক্ষমতা দিয়ে আদেশ দেন। পরবর্তীতে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রত্যেক মাদ্রাসাকে বছরে ৩৬ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক আটশত টাকা অনুদান দেয়ার ঘোষণা প্রদান করে কার্যকরী করার আগেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। বিএনপি'র সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও ধর্মমন্ত্রীসহ সচিব পর্যায়ে বহু মিটিং হওয়ার পর ঘোষণা করা হলো যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মত মাসিক বেতন-ভাতা এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ পাবে। এর বেশ কিছুদিন পর আবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন যে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে বাচাইকৃত এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে আর্থিক অনুদান দেয়া হবে। শুরু হলো বাছাই প্রক্রিয়া, জেলা নির্বাচনী বোর্ড গঠন করে কর্মরত শিক্ষকদের ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। কয়েকটি বিশ্বস্ত সূত্র মতে, এই বাছাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের হয়রানি ও ভোগান্তির শেষ [illegible] না। যে সকল শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর কোনো বেতন-ভাতা পায়নি তাদের জন্য এরকম প্রশাসনিক হয়রানি সত্যিই দুঃখজনক। জেলা নির্বাচনী বোর্ড ইউনিয়ন ওয়ারী মাদ্রাসার তালিকা, সংশ্লিষ্ট সনদপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডিজি অফিসেও প্রেরণের পর দেখা গেল হাতেগোনা কয়েকশ মাদ্রাসার টাকা দেয়া হয়েছে। আবার ১ জন বা দু'জন শিক্ষকের বেশী কোথায়ও দেয়া হয়নি। সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে অধিকাংশ মাদ্রাসারই সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে শিক্ষকগণ অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- যে পদ্ধতি ও জটিলতার মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলোকে অনুদান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এপদ্ধতিগুলো পূর্বেই জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট জানানো দরকার ছিলো। আর যদি জেলা কর্তৃপক্ষ তা জেনেই থাকেন তাহলে তারা কি করে অনুদান দেয়ার সুপারিশ করে কাগজপত্র ঢাকায় পাঠালেন। এরপরেও ঢাকার কোনো কিছু দেখার থাকলে জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসাসমূহকে অনুদান প্রদান করে জরিপ, তদন্ত ইত্যাদি যা চালাবার দরকার চালাতে পারতো। সরকারী টাকা সঠিক খাতে ব্যয় হোক, এটা সকলেরই কাম্য। কয়েকটি বিশ্বস্ত সূত্রের মতে, সরকারী অর্থ বরাদ্দ থাকার পর '৯২-৯৩ অর্থবছরের টাকা ফেরত চলে গেছে। আমলাতান্ত্রিকতার কারণে টাকা খরচ করা যায়নি। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহ মঞ্জুরী পেয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে এর দূরত্ব মাদ্রাসা বোর্ড দেখেনি। অনুদান দেয়ার বেলায় যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এর দূরত্ব হিসাব করতে হয় তাহলে বলতে হবে, একদেশ দু'আইন, এক বাজারে দু'পদ্ধতি। কারণ মাদ্রাসা বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বেসরকারী স্কুলের বেতন, অনুদান দেয়ার পর এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের জন্য আলাদা সেল গঠন করে রেজিস্ট্রেশন প্রথা চালু করে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন মাদ্রাসা বোর্ডের সাথে মিল করে প্রবর্তন করতে পারে।